ব্র্যান্ড প্রস্তুত ও প্রতিযোগীতা মোকাবেলা

Creating Brand and Addressing Compitition

৬

বর্তমান সময়ে মুক্ত বাজার ও বিশ্ব বাণিজ্যের কারণে প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান যার যার অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য সবসময়ই তৎপর থাকে। এইকারণে প্রতিষ্ঠানকে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হয় ও বিভিন্ন সময়োপোযোগী ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করে নিজের অবস্থান করে ও প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করে। ইউনিট ৬ এ কিভাবে ব্র্যান্ড প্রস্তুত করে অবস্থানগ্রহণ ও প্রতিযোগীতা মোকাবেলা করার বিভিন্ন কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটের প্রথম পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে ব্র্যান্ড কী; ব্র্যান্ডিং এ কী ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; এবং সর্বশেষে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি কী ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে প্রতিযোগীতামূলক ফ্রেম অব রেফারেন্স কী তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু ও পয়েন্টস অব প্যারিটি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে; এবং ব্র্যান্ড মন্ত্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটের তৃতীয় পাঠে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ক্রমবিকাশ কৌশল কী; প্রতিযোগী বিশ্লেষণ কী; এবং প্রতিযোগী বিশ্লেষণের ধাপসমূহ। চতুর্থ পাঠে আলোচনা করা হয়েছে বাজার নেতা কে; এবং বাজার নেতার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যাকে। পঞ্চম পাঠে বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী কে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশলসমূহ। সর্বশেষে ষষ্ঠ পাঠে বাজার অনুসারি কে ও বাজার অনুসারীর কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন; এবংতাদের কৌশল আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১ : ব্র্যান্ড প্রস্তুতকরণ
পাঠ - ২ : ব্র্যান্ড অবস্থান গ্রহণ
পাঠ - ৩ : ক্রমবিকাশ কৌশল ও প্রতিযোগী বিশ্লেষণ
পাঠ - ৪ : বাজার নেতার কৌশল
পাঠ - ৫ : বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশল
পাঠ - ৬ : বাজার অনুসারী ও বাজার নিশ্‌র- এর কৌশল

পাঠ-৬.১ ব্র্যান্ড প্রস্তুতকরণ
Creating Brand

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্র্যান্ড কী তা বলতে পারবেন;
- ব্র্যান্ডিং সিদ্ধান্তসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ব্র্যান্ড ইক্যুইটি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিপণনকারী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। ব্র্যান্ড প্রস্তুত করার মাধ্যমে বিপণনকারী পণ্যের একটি অভিন্ন পরিচয় তৈরি করে। এই ব্র্যান্ড প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্র্যান্ড সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে বিপণনকারী ব্র্যান্ড ইক্যুইটির মাধ্যমে প্রতিযোগীতার বাজারে কার্যকরভাবে টিকে থাকতে পারে।

ব্র্যান্ড কী?
What is Brand?

ব্র্যান্ড হলো কোনো চিহ্ন, প্রতীক, নকশা, নাম বা এইসবকিছুর সংমিশ্রণ, যা বিপণনকারী প্রতিযোগী পণ্য বা সেবা থেকে পৃথক করার জন্য ব্যবহার করে। সাধারণত শিল্প পণ্যের তুলনায় ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন- রোলেক্স ঘড়ি, বিএমডব্লিউ গাড়ি, সনি টিভি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত কিছু ব্র্যান্ডের নাম। বাংলাদেশে গ্রামীনফোন সাদা-নীল রং এর মিশ্রণে তিনটি পাতা দিয়ে তাদের ব্র্যান্ড তৈরি করেছে। আবার, বাংলালিংক কমলা ও কালো রঙের মিশ্রণে ডোরাকাটা নকশার মাধ্যমে তার ব্র্যান্ডকে প্রস্তুত করেছে। ক্রেতা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে খুব সহজেই আলাদা করতে

Philip Kotler & Gary Armstrong ব্র্যান্ডকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে, *"Brand is a name, term, sign, symbol or design or a combination of these that identifies the maker of seller of a product of service."* অর্থাৎ পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা পণ্য বা সেবা চিহ্নিত করার জন্য যে সকল নাম, টার্ম, সংকেত, প্রতীক বা নকশা অথবা এইসবকিছুর মিশ্রণে যা ব্যবহার করে তাকে ব্র্যান্ড বলে।
Mccarthy and Perreault এর মতে, "*Branding means the use of a name, term, symbol or design or a combination of these to identify a product.*" অর্থাৎ "ব্র্যান্ডিং হলো কোনো নাম, টার্ম, সংকেত বা ডিজাইন বা এসবের সংমিশ্রণ যা একটি পণ্যকে চিহ্নিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়।"

পারে তাদের প্রতিষ্ঠিত চিহ্ন বা প্রতীকের মাধ্যমে। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করতে পারে। ক্রেতা ব্র্যান্ডের মাধ্যমে পণ্য চিহ্নিত করতে পারে সহজে, পণ্যের প্রতি আস্থা তৈরি হয়, পণ্য বাছাইয়ে সুবিধা হয়, সময় ও পরিশ্রম সাশ্রয় হয়, অন্যান্য পণ্যের সাথে তুলনা করতে পারে এবং প্রতারিত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। আবার, বিক্রেতাও ব্র্যান্ড প্রস্তুতের মাধ্যমে কিছু সুবিধা ভোগ করে। ব্র্যান্ড প্রস্তুতের মাধ্যমে বিক্রেতা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারে, প্রতিযোগিতায় সফলভাবে টিকে থাকতে পারে, নকল প্রতিহত করতে পারে এবং বাজার সম্প্রাসারণ করাও সহজ হয়।

ইন্টারনেট উৎস: https://www.grameenphone.com/ & https://www.banglalink.net/

ব্র্যান্ডিং সিদ্ধান্তসমূহ

Branding Decisions

ব্র্যান্ডিং হলো এমন একটি পণ্যকে অন্য কোনো পণ্য থেকে আলাদা করার জন্য সংকেত, চিহ্ন, নাম, প্রতীক, ডিজাইন, বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করার সাথে সম্পৃক্ত সকল কার্যক্রমের সমষ্টি। প্রতিষ্ঠান সাধারণত ব্র্যান্ড সম্পর্কিত যেসব সিদ্ধান্তের মুখোমখি হয় তা চিত্র ৬.১ এ দেখানো হলো-

ব্র্যান্ডিং	ব্র্যান্ড পৃষ্ঠপোষক	ব্র্যান্ড নাম	ব্র্যান্ড কৌশল	ব্র্যান্ড পুনঃঅবস্থানগ্রহণ
◆ ব্র্যান্ড ◆ ব্র্যান্ডবিহীন	◆ উৎপাদকের ব্র্যান্ড ◆ ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড ◆ লাইসেন্স ব্র্যান্ড	◆ একক ব্র্যান্ড নাম ◆ সকল পণ্য পরিবারের জন্য একটি ব্র্যান্ড নাম ◆ প্রত্যেক পণ্য পরিবারের জন্য পৃথক ব্র্যান্ড নাম ◆ প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড নাম	◆ সারি বর্ধিতকরণ ◆ ব্র্যান্ড বর্ধিতকরণ ◆ বহু ব্র্যান্ড ◆ নতুন ব্র্যান্ড ◆ সহ ব্র্যান্ড	◆ ব্র্যান্ডের পুনঃঅবস্থান গ্রহণ ◆ ব্র্যান্ডের পুনঃঅবস্থান গ্রহণ না করা

চিত্র ৬.১: ব্র্যান্ডিং সিদ্ধান্তসমূহ

১. **ব্র্যান্ডিং সিদ্ধান্ত (Branding Decicions):** বিপণনকারী প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেয় যে পণ্য বিপণনে ব্র্যান্ড করা হবে কি হবে না। ব্র্যান্ড ব্যবহারে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে যেমন- ক্রেতা পণ্যের মান সম্পর্কে অবগত থাকে আবার পরিচিতি তৈরি করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে বিক্রেতা স্থায়ী ও অনুগত ক্রেতা সৃষ্টি করতে পারে।

২. **ব্র্যান্ড পৃষ্ঠপোষক সিদ্ধান্ত (Brand Sponsor Decisions):** ব্র্যান্ড পৃষ্ঠপোষকের ক্ষেত্রে বিপণনকারী তিন ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। (ক) উৎপাদনকারী নিজে যে ব্র্যান্ড তৈরি বা উৎপাদন এবং বিপণন করে তখন তাকে উৎপাদকের ব্র্যান্ড বলে। (খ) মধ্যস্থ ব্যবসায়ী যখন নিজের ব্র্যান্ড নামে পণ্য বিপণন করে তখন তাকে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড বলে। (গ) কোন কোম্পানি যখন নিজের ব্যবহৃত বা তৈরিকৃত পণ্য বা সেবার নাম অন্য উৎপাদকের ব্র্যান্ড নামে টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করার লাইসেন্স দেয় তখন তাকে লাইসেন্স ব্র্যান্ড বলে।

৩. **ব্র্যান্ড নাম সিদ্ধান্ত (Brand Name Decisions):** যেকোন প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্র্যান্ড নাম নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বিপণনকারী সহজ, সুন্দর, মনে রাখার মতো ও অর্থপূর্ণ ব্র্যান্ড নাম তারা নির্বাচন করে থাকে। এক্ষেত্রে চার ধরণের কৌশল অবলম্বন করা হয়। যথা- (ক) প্রতিষ্ঠান যখন প্রতিটি পণ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ড নাম ব্যবহার করে তখন তাকে একক ব্র্যান্ড নাম বলে। (খ) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সকল পণ্যের জন্য একটি নামই ব্যবহার করতে পারে এতে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও বিজ্ঞাপন খরচ কম হয়। (গ) প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের পণ্য উৎপাদন করে, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্যপরিবারের জন্য আলাদা আলাদা পণ্য নাম নির্ধারণ করতে পারে। (ঘ) অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা নাম ব্যবহার করলেও এর সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের নামও ব্যবহার করতে পারে।

৪. **ব্র্যান্ড কৌশল সিদ্ধান্ত (Brand Strategy Decisions):** প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কার্যভিত্তিক, ভাবমূর্তি ও পরীক্ষামূলক ব্র্যান্ড বাজারে উপস্থাপন করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠান চারধরণের কৌশল ব্যবহার করে থাকে। যথা- (ক) বাজারে প্রচলিত ব্র্যান্ডের সফল নাম ব্যবহার করে একই পণ্যবিভাগের পণ্যের রং, ডিজাইন, মোড়কের সামান্য সংযোজন ও পরিবর্তন করে বাজারে আনাকে **পণ্য সারি বর্ধিতকরণ** বলে। (খ) একটি সফল ব্র্যান্ড ব্যবহার করে নতুন কোনো পণ্য বিভাগে নতুন পণ্য বাজারে

সরবরাহকে **ব্র্যান্ড বর্ধিতকরণ** বলে। (গ) প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পণ্যবিভাগের মধ্যে আগের ব্র্যান্ডগুলোর সাথে নতুন কোনো ব্র্যান্ড অর্ন্তভূক্ত করা হলে তাকে **বহু ব্র্যান্ড** বলে। প্রতিষ্ঠান যখন নতুন পণ্যবিভাগের জন্য নতুন কোনো ব্র্যান্ড নিয়ে বাজারে প্রবেশ করে তখন তাকে **নতুন ব্র্যান্ড** বলে।

৫. **ব্র্যান্ড পুনঃঅবস্থানগ্রহণ সিদ্ধান্ত (Brand Repositioning Decisions):** প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়মিতভাবে তার ব্র্যান্ডসমূহের শক্তিশালী ও দুর্বল দিক বিশ্লেষণ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় ব্র্যান্ডের পুনঃঅবস্থানগ্রহণ করা প্রয়োজন কিনা।

ব্র্যান্ড ইক্যুইটি কী?

What is Brand Equity?

সফলভাবে ব্র্যান্ড প্রস্তুত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড ইক্যুইটির সুবিধা ভোগ করতে পারে ব্র্যান্ড ও ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান যে সুবিধা ভোগ করে তাকেই ব্র্যান্ড ইক্যুইটি বলে। অর্থাৎ ব্র্যান্ড ইক্যুইটি হলো ব্র্যান্ডের সার্বিক শক্তি যা বাজার অবস্থান ও প্রতিষ্ঠানের ভ্যালু সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিপণনকারীর বিপণন কার্যক্রমে ঝুঁকি হ্রাস পায়; ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে আনুগত্যতা (Loyalty) বৃদ্ধি পায়; মূল্য বৃদ্ধি পেলেও ক্রেতার মধ্যে অধিক অনমনীয় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আবার উচ্চ ব্র্যান্ড ইক্যুইটির কারণে ব্যবসায়ে সহযোগিতা ও সমর্থন বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রযুক্তি সম্পর্কিত শিল্পে এ্যাপেল (Apple) ব্র্যান্ডের ইক্যুইটি ভ্যালু প্রায় ২০৫.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং গুগল (Google) এর ব্র্যান্ড ইক্যুইটি ভ্যালু ১৬৭.৭ বিলিয়ন ডলার (সূত্র: ফোরবস ওয়েবসাইট)। বিপণনকারীকে ব্র্যান্ড ইক্যুইটি ব্যবস্থাপনা নিতে হয় কারণ এর মাধ্যমে ভোক্তাদের মাঝে ব্র্যান্ডের শক্তিশালী আবেদন সৃষ্টি করা যায় এবং ভবিষ্যতে বিপণনের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

সারসংক্ষেপ:

ব্র্যান্ড হলো কোনো চিহ্ন, প্রতীক, নকশা, নাম বা এইসবকিছুর সংমিশ্রণ, যা বিপণনকারী প্রতিযোগী পণ্য বা সেবা থেকে পৃথক করার জন্য ব্যবহার করে। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করতে পারে। ব্র্যান্ডিং হলো এমন একটি পণ্যকে অন্য কোনো পণ্য থেকে আলাদা করার জন্য সংকেত, চিহ্ন, নাম, প্রতীক, ডিজাইন, বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করার সাথে সম্পৃক্ত সকল কার্যক্রমের সমষ্টি। ব্র্যান্ডিং-এ যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলো হলো - ব্র্যান্ডিং, ব্র্যান্ড পৃষ্ঠপোষক, ব্র্যান্ড নাম, ব্র্যান্ড কৌশল ও ব্র্যান্ড পুনঃঅবস্থানগ্রহণ সিদ্ধান্ত। ব্র্যান্ড ও ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান যে সুবিধা ভোগ করে তাকেই ব্র্যান্ড ইক্যুইটি বলে।

পাঠ-৬.২ ব্র্যান্ড অবস্থান গ্রহণ
Positioning Brand

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রতিযোগীতামূলক ফ্রেম অব রেফারেন্স কী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু ও পয়েন্টস অব প্যারিটি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ব্র্যান্ড মন্ত্র কী তা বলতে পারবেন।

বিপণনকারী কিভাবে বাজার বিভক্তকরণ, লক্ষ্যায়ন ও অবস্থানগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার উপর নির্ভর করে বিপণন কৌশল গ্রহণ করা হয়। বাজারে অবস্থানগ্রহণের জন্য ব্র্যান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রেতার মনে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানদের তুলনায় আকর্ষণীয় ও সবলভাবে নিজের ব্র্যান্ডের গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য ও ভাবমূর্তি তৈরির প্রক্রিয়াকে ব্র্যান্ড অবস্থানগ্রহণ বলা হয়। ক্রেতাদের মনে প্রতিষ্ঠানের অনুকূল অবস্থান তৈরি করার জন্য বিপণনকারী তিনটি ধাপে কাজ করতে পারে। সেগুলো হলো - (১) প্রতিযোগিতামূলক ফ্রেম অব রেফারেন্স প্রস্তুতকরণ, (২) পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু ও পয়েন্টস অব প্যারিটি শনাক্তকরণ এবং (৩) ব্র্যান্ড মন্ত্র সৃষ্টি।

প্রতিযোগীতামূলক ফ্রেম অব রেফারেন্স
Competitive Frame of Reference

ফ্রেম অব রেফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিযোগীতামূলক বিশ্লেষণ করে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত অনেকগুলো ব্র্যান্ডের মধ্যে কোন কোন ব্র্যান্ডের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এরজন্যে বিপণনকারী প্রথমে প্রতিযোগী শনাক্ত ও প্রতিযোগীদের বিশ্লেষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানি তার প্রতিযোগীদের রেটিং এর জন্য পাঁচটি গুণাগুণের (গ্রাহক সচেতনতা, পণ্য মান, পণ্যের সহজলভ্যতা, কারিগরি সহযোগিতা ও বিক্রয়কর্মীর ব্যবহার) উপর ভিত্তি করে ক, খ এবং গ তিনটি কোম্পানির সবলতা-দুর্বলতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করে কোম্পানীগুলোর অবস্থা সারণী ৬.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো কোম্পানি অবস্থান গ্রহণের কৌশল হিসেবে কোম্পানি ক- এর পণ্যের সহজলভ্যতা এই দিক দিয়ে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু কোম্পানি খ-এর কোনো দিকেই তেমন কোনো দুর্বলতা না থাকায় আক্রমণ করা লাভজনক হবে না। অপরদিকে কোম্পানি গ-এর প্রায় সকল দিকই কম-বেশি আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এসব বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে বিপণনকারী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক ফ্রেম অব রেফারেন্স তৈরি করে অবস্থানগ্রহণ কৌশল নির্ধারণ করে থাকে।

প্রতিযোগী	গ্রাহক সচেতনতা	পণ্য মান	পণ্যের সহজলভ্যতা	কারিগরি সহযোগিতা	বিক্রয়কর্মীর ব্যবহার
ক	১	১	৪	৩	২
খ	২	১	১	২	১
গ	৩	৪	২	৩	৪

সারণী ৬.১: প্রতিযোগীতা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

এখানে, ১= খুব ভালে, ২=ভালো, ৩= মোটামুটি ভালো, ৪=খারাপ।

পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু ও পয়েন্টস অব প্যারিটি

Points of Diference and Points of Parity

বিপণনকারী অবস্থান গ্রহণ কৌশল নির্ধারণে প্রতিযোগীতামূলক ফ্রেম অব রেফারেন্স স্থির করার পর সঠিক পার্থক্যের বিন্দু এবং পয়েন্টস অব প্যারিটিকে ব্যবহার করে। পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু হচ্ছে কোনো ব্র্যান্ডের সাথে সংযুক্ত এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ বা সুবিধা যা প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকে এবং যা গ্রাহকরা অনুকূলভাবে মূল্যায়ন করে। একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশক অনেকগুলো উপাদান একই সাথে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। যেমন-Apple এর ক্ষেত্রে হালনাগাদ ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার, সুন্দর ও কার্যকরী ডিজাইন ও সহজ ব্যবহারোপযোগিতা ইত্যাদি হলো পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু। যেকোনো ব্র্যান্ডের জন্য শক্তিশালী, অনুকুল, অভিনব ও চমৎকার ব্র্যান্ড বৈশিষ্ট্য তৈরি করা একটি কঠিন কাজ। কিন্তু প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশে শক্ত ব্র্যান্ড অবস্থান তৈরির জন্য এ বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকর পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে ব্র্যান্ড উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনটি উপাদান গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে পারে- (১) ব্র্যান্ড বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ভোক্তাদের কাছে কাঙ্খিত, প্রয়োজনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। (২) প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে গ্রাহকের মনে ব্র্যান্ড অবস্থান তৈরি ও বজায় রেখে সে অনুযায়ী কাজ করার মত প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রতিষ্ঠানের আছে কিনা সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (৩) প্রতিযোগীদের তুলনায় ব্র্যান্ড বৈশিষ্ট্য কতটুকু স্বতন্ত্র ও উন্নততর সে বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করপ প্রয়োজন হয়। সুতরাং, ব্র্যান্ডে সেইসব সুবিধা বা বৈশিষ্ট্য যোগ করা প্রয়োজন হয় যা গ্রাহকদের কাছে কাঙ্খিত, সরবরাহযোগ্য, পৃথকীকরণযোগ্য, নকলপ্রতিরোধযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান।

অন্যদিকে, পয়েন্টস অব প্যারিটি হলো কোনো পণ্যের ব্র্যান্ডের এমন কিছু গুণাগুণ বা সুবিধা যা বাজারে প্রচলিত অন্যান্য ব্র্যান্ডের প্রায় অনুরূপ। অর্থাৎ ক্রেতা এক্ষেত্রে প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্যের সাথে তেমন কোনো পার্থক্য করতে পারে না। পয়েন্টস অব প্যারিটি হলো সেসব গুণাগণ বা সুবিধা যা ভোক্তারা কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার মধ্যে বিদ্যমান থাকা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। অন্যভাবে বলা যায়, ব্র্যান্ড পছন্দের ক্ষেত্রে পণ্যের মধ্যে এ ধরনের গুণাগুণ বা সুবিধা থাকা প্রয়োজন কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় তা পর্যাপ্ত শর্ত পূরণ করে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেকোনো প্রকৃত ট্রাভেল এজেন্সির পয়েন্টস অব প্যারিটি হলো বিমানের টিকিট ও হোটেল রিজার্ভেশনের সুবিধা প্রদান করা। এর পাশাপাশি ট্রাভেল এজেন্সি যদি গ্রাহকদের ট্যুর প্যাকেজ পরিকল্পনায় সহায়তা করে (যানবাহনের ব্যবস্থা, গাইড সার্ভিস, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণে সহায়তা), বিভিন্ন উপায়ে টিকেটের অর্থ পরিশোধ (কার্ড, নগদ, অনলাইন) ও বুকিং (একমাস, ৭দিন, ৩দিন বা ১দিনের) সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা গ্রাহকদের প্রদান করে তাহলে তাকে পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু বলা যাবে।

ব্র্যান্ড মন্ত্র

Brand Mantra

ব্র্যান্ডের অবস্থানগ্রহণ কৌশল উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্র্যান্ড মন্ত্র বিবেচনা করা হয়। ব্র্যান্ড মন্ত্র হচ্ছে কোনো ব্র্যান্ডের অন্তর্নিহিত বিষয় যা উচ্চারণযোগ্য ও বোধগম্য। এরমাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই ব্র্যান্ডের মূল প্রতিজ্ঞাকে সহজে বুঝতে পারে এবং এটি অন্যান্য ব্র্যান্ড ধারণা ও কার্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকে। ব্র্যান্ড মন্ত্র সাধারণত খুব সংক্ষিপ্ত হয় ও সাধারণত তিন থেকে পাঁচটি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্র্যান্ড মন্ত্রের কাজ হলো ব্র্যান্ডের মূল ভাবধারাকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপন করা। এর মাধ্যমে বিপণনকারী কি ধরনের পণ্য বিক্রয় করতে চাচ্ছে এবং পণ্যটি কীভাবে ভোক্তাদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করবে তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকে। ব্র্যান্ড মন্ত্রের তিনটি মূল শর্ত হলো- (১) ব্র্যান্ড মন্ত্রের মাধ্যমে ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে এবং এটি ব্র্যান্ডের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে। (২) একটি কার্যকর ব্র্যান্ড মন্ত্র অবশ্যই সহজবোধ্য ও স্মরণযোগ্য হয়ে থাকে। সে কারণে এটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন; এবং (৩) প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও সম্ভাব্য ক্রেতা সকলের কাছে ব্র্যান্ড মন্ত্র আবেদনসম্পন্ন ও উৎসাহব্যাঞ্জক হওয়া আবশ্যক।

সারসংক্ষেপঃ

ফ্রেম অব রেফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিযোগীতামূলক বিশ্লেষণ করে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত অনেকগুলো ব্র্যান্ডের মধ্যে কোন কোন ব্র্যান্ডের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এইজন্যে বিপণনকারী প্রথমে প্রতিযোগী শনাক্ত ও প্রতিযোগীদের বিশ্লেষণ করা হয়। বিপণনকারী অবস্থান গ্রহণ কৌশল নির্ধারণে প্রতিযোগীতামূলক ফ্রেম অব রেফারেন্স স্থির করার পর সঠিক পার্থক্যের বিন্দু এবং পয়েন্টস অব প্যারিটিকে ব্যবহার করে। পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু হচ্ছে কোনো ব্র্যান্ডের সাথে সংযুক্ত এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ বা সুবিধা যা প্রতিযোগী ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকে এবং যা গ্রাহকরা অনুকূলভাবে মূল্যায়ন করে। পয়েন্টস অব প্যারিটি হলো কোনো পণ্যের ব্র্যান্ডের এমন কিছু গুণাগুণ বা সুবিধা যা বাজারে প্রচলিত অন্যান্য ব্র্যান্ডের প্রায় অনুরূপ। ব্র্যান্ড মন্ত্র হচ্ছে কোনো ব্র্যান্ডের অন্তর্নিহিত বিষয় যা উচ্চারণযোগ্য ও বোধগম্য।

পাঠ-৬.৩ ক্রমবিকাশ কৌশল ও প্রতিযোগী বিশ্লেষণ
Growth Strategies and Analysing Competitors

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্রমবিকাশ কৌশল কী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রতিযোগী বিশ্লেষণ কী বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- প্রতিযোগী বিশ্লেষণের ধাপসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান কখনো এক অবস্থানে সবসময় থাকে না কারণ গতিশীল ব্যবসায় পরিবেশে টিকে থাকার জন্য প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করে যেতে হয়। এইকারণে প্রতিষ্ঠানকে কাঙ্খিত অবস্থান অর্জন করার জন্য ক্রমবিকাশ কৌশল এবং সেই অবস্থান ধরে রাখার জন্য প্রতিযোগীদের বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

ক্রমবিকাশ কৌশল
Growth Strategies

ক্রমবিকাশ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে নতুন বাজার ও নতুন পণ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠান এক অবস্থান থেকে নতুর আরেক অবস্থানে পৌছে যেতে পারে। ইউনিট দুইয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান ক্রমবিকাশের জন্য আরোও কিছু কৌশল গ্রহণ করতে পারে; যেমন- বাজার অংশ বৃদ্ধি করা, দীর্ঘমেয়াদী অনুগত (Loyal) ক্রেতা ও স্টেকহোল্ডার (Stakeholder) তৈরি করা, শক্তিশালী ব্র্যান্ড প্রস্তুত, নতুন পণ্য বা সেবা উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ ইত্যাদি।

প্রতিযোগী বিশ্লেষণ কী?
What is Analysing Competitors?

বর্তমানে বিপণনকারীকে সফলতার ও দক্ষতার সাথে ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগী কারা, তাদের যোগ্যতা ও কার্যক্রম প্রভৃতি সম্পর্কে বিপণনকারীকে জানতে হয় এবং প্রতিযোগীদের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে কৌশল গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে ক্রেতা প্রতিযোগীদের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। এজন্য বিপণনকারীকে প্রতিযোগী বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রতিযোগী বিশ্লেষণে বিপণনকারী প্রতিযোগীদের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, কৌশল, শক্তিশালী ও দুর্বল দিক প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিযোগী বিশ্লেষণ হচ্ছে অনেকগুলো কাজের সমষ্টি; যথা- মূল প্রতিযোগীদের চিহ্নিত করা; তাদের উদ্দেশ্য, কৌশল, শক্তি ও দুর্বলতা এবং প্রতিক্রিয়ার ধরন পরিমাপ করা তাছাড়া কোনো প্রতিযোগীকে টার্গেট করা হবে, কোন প্রতিযোগীকে এড়িয়ে যাওয়া হবে, কোন প্রতিযোগীকে গুরুত্বহীন ভাবা হবে আবার কোন প্রতিযোগীকে আক্রমণ করতে হবে তা নির্ধারণ করা। সুতরাং বলা যায়, প্রতিযোগী বিশ্লেষণ হচ্ছে কতগুলো কাজের সমষ্টি, যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগী চিহ্নিত করে প্রতিযোগীদের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, কৌশল, শক্তি, দুর্বলতা বিশ্লেষণ করা হয়, আক্রমণ ও এড়িয়ে যাবার জন্য কৌশল অবলম্বন করা হয়।

প্রতিযোগী বিশ্লেষণের ধাপসমূহ
Steps of Analysing Competitors

প্রতিযোগীতামূলক বিপণন কৌশল করার জন্য কতগুলো ধাপের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের বিশ্লেষণ করা হয় তা চিত্র ৬.২ এ দেখানো হলো-

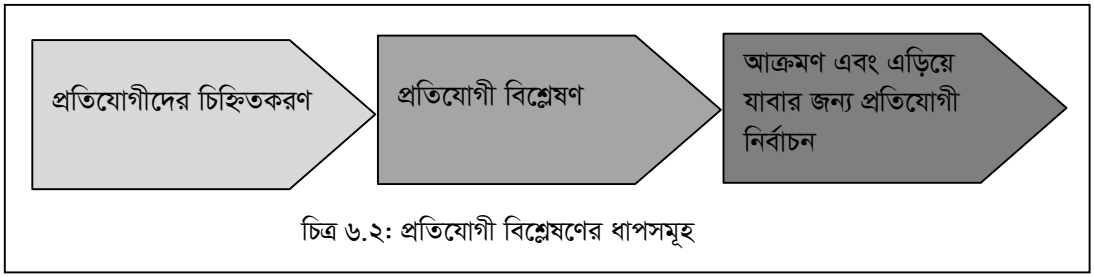

চিত্র ৬.২: প্রতিযোগী বিশ্লেষণের ধাপসমূহ

১. **প্রতিযোগী শনাক্তকরণ (Identifying Competitors):** প্রতিযোগীদের শনাক্ত করার বিষয়টি শিল্প ও বাজার উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়। একটি শিল্পের অন্তর্গত যেসব ফার্ম এমন কোনো পণ্য বা পণ্যশ্রেণি অর্পণ করে যা একটি অপরটির বিকল্প তাকে প্রতিযোগীতা বলে। আবার ভোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিযোগী বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যারা গ্রাহকদের একই ধরনের প্রয়োজন মেটায়। প্রতিযোগী শনাক্ত করার জন্য প্রথমেই শ্রেণিগত সদস্য সংখ্যা (Category Membership) নির্ধারণ করতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পণ্যের শ্রেণি সদস্য হবে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পণ্য বা বিকল্প পণ্য যাদের সাথে সেই ব্র্যান্ডকে প্রতিযোগীতা করতে হচ্ছে। যেমন- কোমলপানীয় প্রাণকোলাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগীতা করতে হচ্ছে কোকাকোলা, আরসি কোলা, প্রাণকোলা, ফিজআপ, মোজো ইত্যাদি ব্র্যান্ডের সাথে। আবার পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ফ্রুটজুস এবং এনার্জি ড্রিংক ও চা-কফির সঙ্গেও প্রাণকোলাকে প্রতিযোগীতা করতে হয়। তাই সব সময় প্রতিযোগীদের সহজে শনাক্ত করা যায় এমনটি নয়।

২. **প্রতিযোগী বিশ্লেষণ (Analyzing Competitors):** প্রতিযোগীদের শনাক্ত করার পর বিশ্লেষণ করে বের করতে হয় কোন প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্য, কৌশল, সবলতা, দুর্বলতা এবং প্রতিক্রিয়ার ধরন। নিম্নে আলোচনা করা হলো-

   ক) **উদ্দেশ্য পরিমাপ করা (Assessing Objectives) :** মুনাফাযোগ্যতা, নগদ টাকা আয়, বাজার অংশ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব, সেবা নেতৃত্ব ইত্যাদি উদ্দেশ্যের সমন্বয়ে প্রত্যেক প্রতিযোগীর একটি উদ্দেশ্য মিশ্রণ থাকে। এসব উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রতিযোগী কোনোটিকে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তা প্রতিষ্ঠানকে জানতে হবে। এতে প্রতিযোগীর সন্তুষ্টি এবং ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

   খ) **কৌশল চিহ্নিত করা (Identifying Strategies):** সমজাতীয় কৌশল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগীতা বেশি হয়। যেমন- যেসব প্রতিষ্ঠান কমদামে প্রতিযোগীতা করে তাদেরকে একটি দল আবার বেশিদামে প্রতিযোগীতাকারী প্রতিষ্ঠানকে আরেকটি দল করে প্রতিযোগীর কৌশলগত দল নির্ধারণ করতে পারে।

   গ) **প্রতিযোগীর দুর্বল ও সবল দিক পরিমাপ (Assess Competitor's Weaknesses and Strengths):** প্রতিযোগীরা কি কাজ করতে পারে বা কী প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে এটা বোঝার জন্য প্রতিষ্ঠানকে সতর্কভাবে প্রাতিযোগিদের শক্তিশালী ও দুর্বল দিক পরিমাপ করতে হয়। প্রতিষ্ঠান বিপণন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

   ঘ) **প্রতিক্রিয়ার ধরন পরিমাপ করা (Assessing Reaction Patterns):** এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান পূর্বানুমান করে বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে প্রতিযোগী কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। প্রতিযোগীদের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, কৌশল, সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে জানা থাকলে প্রতিযোগীর প্রতিক্রিয়া অনুমান করা সহজ হয়।

৩. **আক্রমণ এবং এড়িয়ে যাবার জন্য প্রতিযোগী নির্বাচন (Selecting Competitors to Attack and Avoid):** প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগী সনাক্ত করার পরে সিদ্ধান্ত নেয় কাকে সে আক্রমণ করবে আর কাকে এড়িয়ে যাবে। এক এক প্রতিযোগীদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

ক) দুর্বল বনাম শক্তিশালী প্রতিযোগী (Weak versus Strong Competitors) : অনেক প্রতিষ্ঠানই দুর্বল প্রতিযোগীদের আক্রমণ করতে চায় কারণ এতে লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে দুর্বল প্রতিযোগীকে আক্রমণ করা সহজ হলেও লাভ খুব সামান্য হয়ে থাকে। তাই অনেক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী প্রতিযোগীদের আক্রমণ করা উচিত বলে মনে করে।

খ) নিকট বনাম দূরবর্তী প্রতিযোগী (Close versus Distant Competitors) : প্রতিষ্ঠান তার কাছাকাছি বা নিকটতম প্রতিযোগীকে যেমন আক্রমণ করতে পারে তেমনি দূরবর্তী প্রতিযোগীকেও আক্রমণ করতে পারে।

গ) ভদ্র বনাম সংহতিনাশক প্রতিযোগী (Well Behaved versus Distruptive Competitors): প্রতিযোগীতা থাকার ফলে প্রতিষ্ঠান কিছু কৌশলগত সুবিধা পায়। যেমন- মোট চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা, বাজার ও পণ্য উন্নয়ন, আইন প্রণেতাদের সাথে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্য পৃথকীকরণ ইত্যাদি। ভদ্র প্রতিযোগী নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে ফলে প্রতিষ্ঠান কৌশলগত সুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু সংহতিনাশক প্রতিযোগী নিয়ম ভঙ্গ করে তাই অনেক প্রতিষ্ঠান ভদ্র প্রতিযোগীর পরিবর্তে সংহতিনাশক প্রতিযোগীদের আক্রমণের পথ বেছে নেয়।

সারসংক্ষেপ:

ক্রমবিকাশ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে নতুন বাজার ও নতুন পণ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠান এক অবস্থান থেকে নতুর আরেক অবস্থানে পৌছে যেতে পারে। ইউনিট দুইয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- বাজার অংশ বৃদ্ধি করা, দীর্ঘমেয়াদী অনুগত ক্রেতা ও স্টেকহোল্ডার তৈরি করা, শক্তিশালী ব্র্যান্ড প্রস্তুত, নতুন পণ্য বা সেবা উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ ইত্যাদি। প্রতিযোগী বিশ্লেষণে বিপণনকারী প্রতিযোগীদের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, কৌশল, শক্তিশালী ও দুর্বল দিক প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিযোগী বিশ্লেষণ হচ্ছে অনেকগুলো কাজের সমষ্টি; যথা- মূল প্রতিযোগীদের চিহ্নিত করা; তাদের উদ্দেশ্য, কৌশল, শক্তি ও দুর্বলতা এবং প্রতিক্রিয়ার ধরন পরিমাপ করা তাছাড়া কোনো প্রতিযোগীকে টার্গেট করা হবে, কোন প্রতিযোগীকে এড়িয়ে যাওয়া হবে, কোন প্রতিযোগীকে গুরুত্বহীন ভাবা হবে আবার কোন প্রতিযোগীকে আক্রমণ করতে হবে তা নির্ধারণ করা।

পাঠ-৬.৪ বাজার নেতার কৌশল
Strategies of Market Leader

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাজার নেতা কে তা বলতে পারবেন; এবং
- বাজার নেতার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভোক্তার প্রয়োজন ও চাহিদা কত ভালোভাবে পূরণ করছে, মোট বাজার দখল করে আছে ইত্যাদির উপর

বাজার নেতা	বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী	বাজার অনুসারি	বাজার নিশার
৪০%	৩০%	২০%	১০%

চিত্র ৬.৩: আনুমানিক বাজার কাঠামো

নির্ভর করে বাজার কাঠামো তৈরি হয়। চিত্র ৬.৩ এ দেখানো হয়েছে একটি বাজার কাঠামো সাধারণত বাজার নেতা, বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী, বাজার অনুসারি ও বাজার নিশার দ্বারা গঠিত হয়। পরবর্তী পাঠগুলোতে বাজার কাঠামোর প্রতিটি অংশগ্রহণকারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাজার নেতা কে?
Who is Market Leader?

নির্দিষ্ট কোনো বাজার কাঠামোতে বাজার নেতার বাজার শেয়ার সবচেয়ে বেশি যা প্রায় ৪০%। বাজার নেতা যে মূল্য নির্ধারণ করে, পণ্য প্রর্বতন করে, বণ্টন বা প্রসারের কৌশল অবলম্বন করে অন্যান্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান তা অনুসরণ করে থাকে। প্রায়ই বাজার নেতা অন্যদের আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে। বাজার নেতা তার অবস্থান ধরে রাখার জন্য সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারণ কৌশল, বাজার শেয়ার রক্ষা কৌশল এবং বাজার শেয়ার সম্প্রসারণ কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

বাজার নেতার কৌশল
Market Leader's Strategies

বাজার নেতা অবস্থান ধরে রাখার জন্য নিম্নোক্ত তিনটি কৌশলের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারে-

১. **সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারণ (Expanding the Total Market):** নতুন ক্রেতা অনুসন্ধান বা বর্তমান ক্রেতাদের বেশি ব্যবহার করানোর মাধ্যমে নেতা সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারিত করতে পারে।

   ক) **নতুন ক্রেতা (New Customers):** নতুন ক্রেতা খুঁজে বের করে বাজার নেতা পণ্যের সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে। এজন্য তিনটি কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা- (i) বাজার প্রবেশ কৌশল; (ii) নতুন বাজার বিভাজন কৌশল ও (iii) ভৌগোলিক সম্প্রসারণ কৌশল। এই কৌশলগুলো পাঠ ২.২ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

   খ) **বেশি ব্যবহার (More usage):** প্রতিষ্ঠান দুইভাবে পণ্যের ব্যবহার বাড়িয়ে বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে। যথা- ব্যবহারের পরিমাণ ও ব্যবহারের ঘনত্ব। **(i) ব্যবহার পরিমাণ:** প্রতিবার বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠান পণ্যের সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে। যেমন- টুথপেস্ট দিয়ে দিনে

দুইবার দাঁত পরিষ্কার করলে দাঁত ভালো থাকবে- এইধরণের বিজ্ঞাপন প্রচার করে টুথপেষ্ট বিক্রেতা বেশি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করছে। **(ii) ব্যবহারের ঘনত্বঃ** নতুন ও ভিন্ন উপায়ে পণ্যটি ব্যবহার করে পণ্য ব্যবহারের ঘনত্ব বাড়ানো যায়। যেমন- জিরোক্যাল চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার কর হয়। এই জিরোক্যাল ব্যবহার করে চা ছাড়াও সেমাই, আইসক্রিম, কুলফি, কেক, হালুয়া এবং বিভিন্ন ধরনের ঘরে তৈরি মিষ্টি রেসিপি প্রকাশ করেছে।

২. **বাজার শেয়ার রক্ষা করা (Protecting Market Share):** যেহেতু নেতার বাজার শেয়ার সবচেয়ে বেশি তাই আত্মরক্ষা বাজার নেতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাজার শেয়ার বেশি হওয়ায় প্রতিযোগীরা বাজার নেতাকেই আক্রমণের জন্য বেছে নেয়। এজন্য নেতাকে আত্মরক্ষার কৌশল গ্রহণ করতে হয়। দুইটি উপায়ে বাজার শেয়ার রক্ষার জন্য কাজ করতে পারে; যথা- পূর্বক্রিয়া বিপণন ও আত্মরক্ষামূলক বিপণন। নিচে এ দু'টি কাজের আলোচনা করা হলো-

ক) পূর্বক্রিয়া বিপণন (Proactive Marketing) : অনেক প্রতিষ্ঠান মনে করে তাদের কাজ হলো ক্রেতাদের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়ানো। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান পূর্বক্রিয়া বিপণন অনুশীলন করে তারা ক্রেতার পূর্বেই ক্রেতার প্রয়োজনকে চিহ্নিত করে ও বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করে। ক্রেতাদের প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে তিন ধরনের বিপণন কার্যক্রম চালানো হয়। যথা- **(i) সাড়ামূলক বিপণন (Responsive Marketing):** এক্ষেত্রে বিপণনকারী প্রকাশিত প্রয়োজন খুঁজে বের করে এবং তা পূরণের চেষ্টা করে। **(ii) আগাম আভাসমূলক বিপণন (Anticipative Marketing):** পূর্বাভাসমূলক বিপণনকারী নিকট ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে, ক্রেতার এমন প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করা। **(iii) সৃষ্টিশীল বিপণন (Creative Marketing):** এক্ষেত্রে যেসব সমাধান ক্রেতা চায়নি বিপণনকারী এমন প্রয়োজনের সমাধান আবিষ্কার করে। সুতরাং পূর্বক্রিয়া বিপণনকারীর পূর্বক্রিয়া দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। মানুষের প্রয়োজন পূর্বানুমানের ক্ষমতা, এবং সমাধান উদ্ভাবনের সৃজনশীলতা থাকলেই পূর্বক্রিয়া বিপণন কার্যক্রম চালানো সম্ভব।

খ) আত্মরক্ষামূলক বিপণন (Defensive Marketing): বাজার নেতাকে নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্য আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠান আত্মরক্ষামূলক বিপণন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের কাছ থেকে নিজের অর্জিত বাজার শেয়ারকে রক্ষা করতে পারে। চিত্র ৬.৪ এর মাধ্যমে নেতার ৬টি আত্মরক্ষার কৌশল দেখানো হলো:

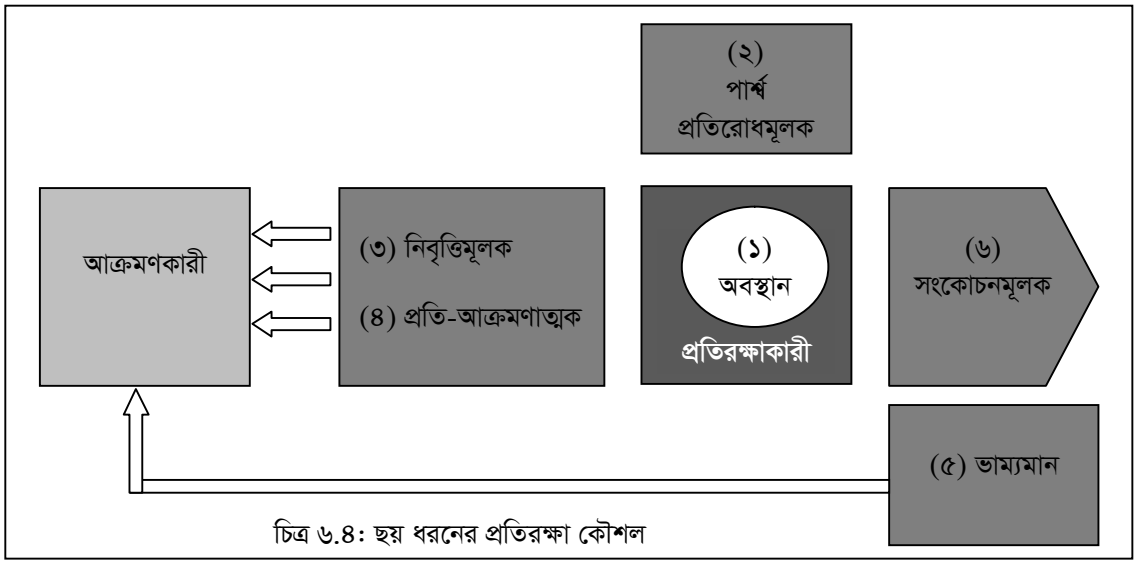

চিত্র ৬.৪: ছয় ধরনের প্রতিরক্ষা কৌশল

(i) অবস্থান প্রতিরক্ষা (Position Defense) : বাজার নেতা উৎকৃষ্ট ব্র্যান্ড শক্তি তৈরি করে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে। এজন্য নেতাকে ক্রমাগতভাবে বিদ্যমান পণ্যের মান উন্নয়ন করতে হয় এবং নতুন পণ্য বাজারে ছাড়তে হয়। এতে কোম্পানির প্রতি ক্রেতাদের আস্থা তৈরি হয়

যা প্রতিযোগীদের দূরে ঠেলে দেয়। উৎকৃষ্ট ব্র্যান্ড শক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে ব্র্যান্ডটিকে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা অবস্থান প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

(ii) **পার্শ্ব প্রতিরোধমূলক প্রতিরক্ষা (Flank Defense)**: প্রতিযোগীরা সাধারণত নেতার দুর্বল স্থানে আঘাত করে এজন্য নেতাকে দুর্বল স্থানের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়।

(iii) **নিবৃত্তিমূলক প্রতিরক্ষা (Preemptive Defense)**: এ কৌশলে বাজার নেতা প্রতিযোগী আক্রমণ করার পূর্বেই প্রতিযোগীকে আক্রমণ করা হয়। প্রতিযোগী কর্তৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকলেই সাধারণত এ কৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমন- মূল্য হ্রাস করে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, বা নতুন মডেল প্রবর্তন, ব্যয় হ্রাস, বণ্টন দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি মাধ্যমে আক্রমণ করা যায়।

(iv) **প্রতি-আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা (Counter-offensive Defense)**: এক্ষেত্রে প্রতিযোগী আক্রমণ করলে নেতা প্রতিযোগীকে পাল্টা আক্রমণ করে। বাজার নেতা প্রতিযোগীকে মুখোমুখি বা পার্শ্ব আক্রমণ করতে পারে। প্রতি-আক্রমণাত্মক কৌশলে আক্রমণকারীর মূল এলাকায় আক্রমণ করা হয়ে এতে মূল এলাকা রক্ষা করার জন্য প্রতিযোগী কিছু দুর্বল স্থান ছেড়ে দেয়। সেই স্থান তখন বাজার নেতা দখল করে নিতে পারে। এইক্ষেত্রে বাজার নেতা মূল্য হ্রাস, মান উন্নয়ন, পণ্য ক্রয়ে ক্রেতাদের নিরুৎসাহিত করা, প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কৌশল ব্যবহার করে।

(v) **ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষা (Mobile Defense)**: এ কৌশলে বাজার নেতা নতুন নতুন এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে যেনো ভবিষ্যতে সেইসব এলাকাকে কেন্দ্র করে আক্রমণ বা আত্মরক্ষা করতে পারে। দুইভাবে ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষা করা যায়। প্রথমত, বাজার সম্প্রসারণ করা। এতে বর্তমান পণ্যের বাইরে নতুন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, বাজার বৈচিত্র্যকরণ করা। এতে বর্তমান পণ্যের সাথে সম্পর্কহীন পণ্য তৈরি করা হয় যাতে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

(vi) **সংকোচনমূলক প্রতিরক্ষা (Contraction Defense)**: এক্ষেত্রে বাজার নেতা কম লাভজনক বাজার অংশ ত্যাগ করে বেশি লাভজনক অংশে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে। এরফলে দুর্বল অবস্থান থেকে সম্পদ শক্তিশালী স্থানে নিয়োজিত করা হয়।

৩. **বাজার শেয়ার সম্প্রসারণ (Expanding Market Share)**: এক্ষেত্রে বাজার নেতা তার বাজার শেয়ার সম্প্রসারণের চেষ্টা চালায়। সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারণে বাজার নেতা নিজের ব্র্যান্ডের বিক্রয় বাড়ানোর চেষ্টা করে। তবে বাজার শেয়ার বাড়লেই মুনাফাযোগ্যতা বাড়বে তা সব সময় ঠিক নয়। যেমন- বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করার ব্যয় যদি বেশি হয় তাহলে মুনাফা নাও বাড়তে পারে। বাজার শেয়ার সম্প্রসারণে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ খেয়াল রাখতে হয়-

ক) **একক ব্যয় হ্রাস (Unit Cost Decrease)** : বাজার শেয়ার বৃদ্ধি পেলে পণ্যের বিক্রয় বদ্ধি পাবে। এতে বেশি পরিমাণে উৎপাদন হবে যা একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করবে যারফলে কোম্পানি লাভবান হবে। কিন্তু বাজার শেয়ার বাড়লেও যদি একক ব্যয় না কমে, তাহলে লাভ ততটা হবে না।

খ) **উৎকৃষ্ট মানের পণ্য অর্পণ (Offering Superior Quality Product)** : প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগী অপেক্ষী উৎকৃষ্ট মানের পণ্য অর্পণ করে উচ্চ মূল্য ধার্য করতে পারে। তবে যদি মান উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে বেশি মল্য আদায় করা যায় তাহলে প্রতিষ্ঠান লাভবান হবে। নতুবা বেশি মূল্যের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ মান উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়ে যাবে। বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে নেতাকে চারটি বিষয় ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

গ) **একচেটিয়া ব্যবসায় (Monopoly Business)**: বাজার নেতার বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করাকে অন্য প্রতিযোগীরা একচেটিয়া ব্যবসায় সৃষ্টির প্রচেষ্টা হিসেবে অভিযোগ তুলতে পারে। তাই এ বিষয়ে নেতাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ) **ভুল বিপণন মিশ্রণ কৌশল (Wrong Marketing Mix Strategy** : বাজার শেয়ার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাজার নেতার বিপণন মিশ্রণ কৌশল ভুল হতে পারে। এতে বাজার শেয়ার বৃদ্ধি নাও পেতে পারে, বা বৃদ্ধি পেলেও তা নেতার জন্য লাভজনক নাও হতে পারে।

ঙ) **প্রকৃত এবং উপলব্ধিকৃত মানের প্রভাব (Effect of Actual and Perceived Quality)**: অনেকসময় ক্রেতা মনে করে যে, প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা বেশি হলে সবাইকে যথাযথভাবে সেবা দেয়া সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে

নেতাকে বাজার শেয়ার সম্প্রসাণের সময় পণ্যের প্রকৃত ও উপলব্ধিকৃত মানের বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়।

সারসংক্ষেপঃ

নির্দিষ্ট কোনো বাজার কাঠামোতে বাজার নেতার বাজার শেয়ার সবচেয়ে বেশি থাকে। বাজার নেতা তার অবস্থান ধরে রাখার জন্য সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারণ কৌশল, বাজার শেয়ার রক্ষা কৌশল এবং বাজার শেয়ার সম্প্রসারণ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। নতুন ক্রেতা অনুসন্ধান বা বর্তমান ক্রেতাদের বেশি ব্যবহার করানোর মাধ্যমে নেতা সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারিত করতে পারে। যেহেতু নেতার বাজার শেয়ার সবচেয়ে বেশি তাই আত্মরক্ষা বাজার নেতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাজার শেয়ার বেশি হওয়ায় প্রতিযোগীরা বাজার নেতাকেই আক্রমণের জন্য বেছে নেয়। এজন্য নেতাকে আত্মরক্ষার কৌশল গ্রহণ করতে হয়। আবার, অনেকসময় বাজার নেতা তার বাজার শেয়ার সম্প্রসারণের চেষ্টা চালায়। নিজের ব্র্যান্ডের বিক্রয় বাড়ানোর চেষ্টা করে বাজার নেতা সামগ্রিক বাজার সম্প্রসারণ করে।

পাঠ-৬.৫ বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশল
Strategies for Market Challenger

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী কে তা বলতে পারবেন; এবং
- বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পাবেন।

বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী কে?
Who is Market Challenger?

বাজার নেতার নিকটতম প্রতিযোগীই হলো বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী। বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রতিযোগিতামূলক কৌশল অবলম্বন করে বাজার নেতাকে আক্রমণ করে। উচ্চ ঝুঁকি থাকলেও বাজার নেতার দুর্বল দিকগুলো জেনে আঘাত করলে এরা অনেকসময়ই সফল হতে পারে। তাদের মূল লক্ষ্য থাকে বাজার নেতা হওয়া। আবার অনেক সময় বাজার নেতাকে আক্রমণ না করে বাজারে নিজের আয়তনের সমান বা ছোটো প্রতিষ্ঠানকেও বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রমণ করতে পারে। সমগ্র বাজার কাঠামোতে তারা প্রায় ৩০% বাজার দখল করে থাকে।

বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশলসমূহ
Strategies for Market Challenger

বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগীতামূলক কৌশলসমূহ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. **কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রতিপক্ষ সংজ্ঞায়িত করা (Defining the Strategic Objective and Opponents):** প্রথমেই বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার কৌশলগত উদ্দেশ্য স্থির বা সংজ্ঞায়িত করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য থাকে বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করা। বাজার শেয়ার বৃদ্ধির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিপক্ষ বা কাকে আক্রমণ করবে তা ঠিক করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করতে পারে-

   ক) **বাজার নেতাকে আক্রমণ (Attack the Market Leader):** বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী বাজার নেতাকে আক্রমণের জন্য বেছে নিতে পারে। নেতাকে আক্রমণ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজার শেয়ার দখল করা। বাজার নেতৃত্ব গ্রহণ করার ঝুঁকি বেশি থাকলেও এখানে লাভের সম্ভাবনাও অনেক বেশি। তবে এক্ষেত্রে সফল হতে হলে কিছু প্রতিযোগীতামূলক সুবিধা থাকা আবশ্যক। যেমন- মূল্য কমানোর জন্য উৎপাদন খরচ কম হওয়া বা একই মূল্যে অধিক সেবা দানের সামর্থ্য থাকা।

   খ) **সম-আয়তনের প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ (Attack Firms of its Own Size):** বাজার নেতার আয়তন ও সম্পদ বেশি হওয়া নেতাকে পরাজিত করা কঠিন হয়। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের সম-আয়তনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আক্রমণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী যথাযথভাবে ক্রেতাদের সেবা দিতে পারে না বা আর্থিকভাবে দুর্বল এমন প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে প্রতি সহজেই সফল হতে পারে।

   গ) **ছোট স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ (Attack Small Local or Regional Firms):** বাজার নেতার আয়তন ও সামর্থ্য এবং ঝুঁকি বেশি থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছোট স্থানীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করতে পারে। এদের আত্মরক্ষার ভাল কৌশল থাকে না তাই বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী সফল হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর ছোট ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করার মূল উদ্দেশ্য থাকে বাজার থেকে উচ্ছেদ করা বাজার শেয়ার দখল করা যায়।

২. **সাধারণ আক্রমণ কৌশল পছন্দ করা (Choosing a General Attack Strategy):** উদ্দেশ্য ও প্রতিপক্ষ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা পর বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রমণ কৌশল অনুযায়ী কাজ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী ৫টি কৌশলে আক্রমণ করতে পারে। নিচের চিত্র ৬.৫ এর মাধ্যমে তা দেখানো হলো-

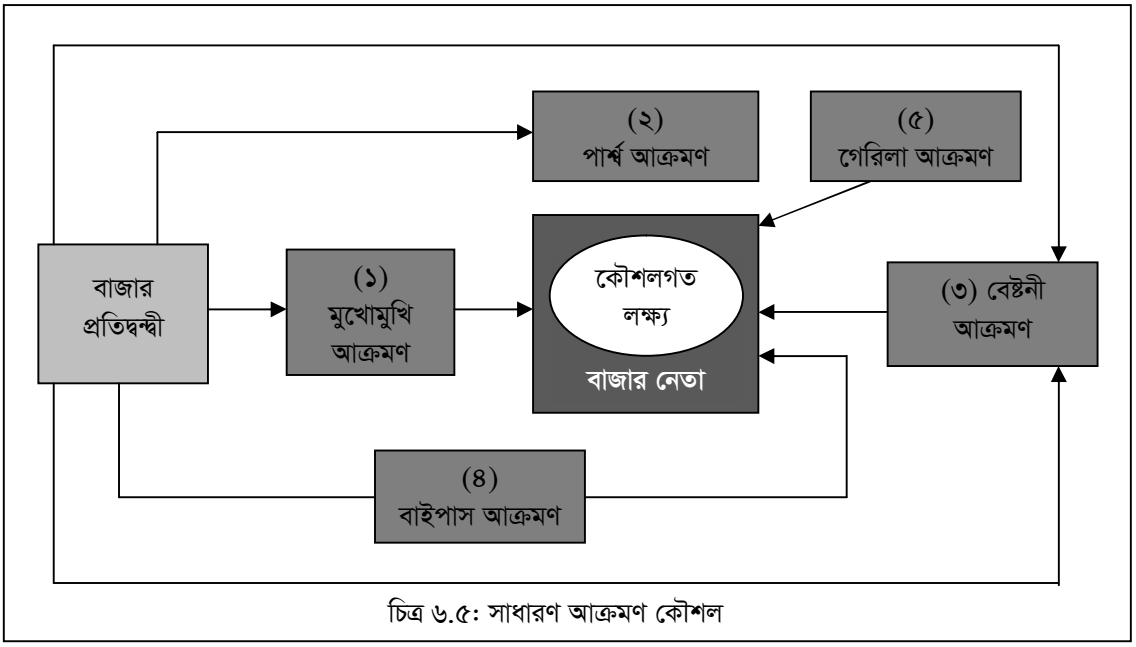

চিত্র ৬.৫: সাধারণ আক্রমণ কৌশল

ক) **মুখোমুখি আক্রমণ (Frontal Attack):** এক্ষেত্রে বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগীর পণ্য, বিজ্ঞাপন, মূল্য বা বণ্টন প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রতিযোগীকে মুখোমুখি আক্রমণ করে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগীর দুর্বল স্থানে আক্রমণ না করে শক্তিশালী স্থানে আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী ও কৌশলগতভাবে দক্ষ কোম্পানিরই জেতার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই প্রতিযোগীর তুলনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর আর্থিক অবস্থা খুব বেশি ভাল হলেই এ ধরনের আক্রমণে যাওয়া সমীচিন হয়। এছাড়াও প্রতিযোগীর অস্তিত্বের প্রশ্ন থাকায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর শক্তিশালী পাল্টা আঘাত হানতে পারে। তাই প্রস্তুতি নিয়েই আক্রমণ করতে হয়। পণ্য, মূল্য, বণ্টন বা বিজ্ঞাপন কোনো না কোনো দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে এই ধরণের আক্রমণে জিততে পারে।

খ) **পার্শ্ব-আক্রমণ (Flank Attack):** এ কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি আক্রমণ না করে পাশ দিয়ে প্রতিযোগীর দুর্বল জায়গা লক্ষ্য করে আক্রমণ করে এবং শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে। পার্শ্ব-আক্রমণ দুটি কৌশলগত দিক থেকে পরিচালিত হতে পারে- **(i) ভৌগোলিক (Geographical):** এক্ষেত্রে প্রতিযোগী যেসব ভৌগোলিক এলাকায় এখনো ব্যাপকভাবে বিপণন কার্যক্রম চালাচ্ছে না সেসব স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী বাজার দখল করার চেষ্টা করে। **(ii) বিভাগভিত্তিক (Segmental):** এ কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বী বাজারের নতুন নতুন চাহিদা চিহ্নিত করে তা পূরণের চেষ্টা করে। প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পদ সীমিত হলে এ কৌশল উপযোগী এবং এতে জয়ের সম্ভাবনা বেশি।

গ) **বেষ্টনি আক্রমণ (Encirclement Attack):** এই কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বী একযোগে প্রতিযোগীর বিভিন্ন বাজার অংশে আক্রমণ করে তাকে দিশেহারা করে দেয়া হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগীর চেয়ে আর্থিকভাবে শক্তিশালী হলে সব দিক দিয়ে এভাবে আক্রমণ করা সম্ভব হয়। এই আক্রমণের ফলে প্রতিযোগী দুর্বল বাজার অংশ ছেড়ে দিয়ে শক্তিশালী অংশ রক্ষায় সচেষ্ট হয়। সেইসুযোগে প্রতিযোগীর দুর্বল বাজার অংশগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী দখল করে নেয়।

ঘ) **বাইপাস আক্রমণ (Bypass Attack):** এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রতিযোগীকে আক্রমণ করা হয়। প্রতিযোগীকে এড়িয়ে বা বাইপাস করে সহজ বাজার অংশে আক্রমণ করা হয়। তিনভাবে বাইপাস আক্রমণ করা যায়। যথা- **(i) নতুন প্রযুক্তি (New Technology):** এ কৌশলে গবেষণার মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে পণ্য তৈরি ও বিপণন করা হয়। **(ii) সম্পর্কহীন পণ্য (Irrelevant Product):** এ কৌশলে

প্রতিযোগী যে ধরনের পণ্য বিপণন করে, প্রতিদ্বন্দ্বী তার সাথে সম্পর্কহীন পণ্য বাজারে নিয়ে আসে। **(iii) নতুন ভৌগোলিক বাজার (New Geographical Market):** প্রতিদ্বন্দ্বী এমন ভৌগোলিক বাজারে পণ্য বিক্রয় করতে পারে, যেখানে প্রতিযোগী বিক্রয় করছে না।

ঙ) **গেরিলা আক্রমণ (Guarilla Attack) :** প্রতিদ্বন্দ্বীর আর্থিক অবস্থা প্রতিযোগীর চেয়ে দুর্বল হলে এ কৌশলে আক্রমণ করা যেতে পারে। এতে প্রতিযোগীর বিভিন্ন বাজার বিভাগে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করা হয়। এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য থাকে প্রতিযোগিকে ব্যস্ত রাখা ও মনোবল হ্রাস করা।প্রচলিত ও অপ্রচলিত অনেক উপায়ে গেরিলা আক্রমণ চালানো হয়। যেমন- কিস্তিতে পণ্য বিক্রয়, মূল্যহ্রাস, হোম ডেলিভারী ইত্যাদি।

৩. **সুনির্দিষ্ট আক্রমণ কৌশল পছন্দ করা (Choosing a Specific Attacking Technique) :** এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বীকে আরও কিছু সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে পারে। যথা- উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, মূল্য বাট্টা, পণ্য বিস্তার, কম দামি পণ্য, ভ্যালু মূল্য ভিত্তিক পণ্য ও সেবা, বণ্টন উদ্ভাবন, ব্যাপক বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ:

বাজার নেতার নিকটতম প্রতিযোগীই হলো বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী। বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রতিযোগিতামূলক কৌশল অবলম্বন করে বাজার নেতাকে আক্রমণ করে। তিনটি উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রমণ করে থাকে। প্রথমত, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রতিপক্ষ সংজ্ঞায়িত করা; এক্ষেত্রে বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার কৌশলগত উদ্দেশ্য স্থির বা সংজ্ঞায়িত করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য থাকে বাজার শেয়ার বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, সাধারণ আক্রমণ কৌশল পছন্দ করা; উদ্দেশ্য ও প্রতিপক্ষ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা পর বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী পাঁচ ধরণের আক্রমণ কৌশল অনুযায়ী কাজ করে। এবং সর্বশেষে, সুনির্দিষ্ট আক্রমণ কৌশল পছন্দ করা।

পাঠ-৬.৬ বাজার অনুসারী ও বাজার নিশ্‌র- এর কৌশল
Strategies for Market Follower and Market Nicher

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাজার অনুসারি কে ও বাজার অনুসারীর কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- বাজার নিশার কে ও বাজার নিশার-এর কৌশল আলোচনা করতে পারবেন।

বাজার অনুসারি কে?
Who is Market Follower?

যেসব প্রতিষ্ঠান বাজার নেতার সাথে প্রতিযোগিতা না করে, নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করে বাজার শেয়ার ধরে রাখে ও বাজার নেতাকে অনুসরণ করে তাদেরকে বাজার অনুসারি বলে। বাজার কাঠামোর প্রায় ২০% বাজার অনুসারি দখলে থাকে। বাজার অনুসারি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অনুকরণ কৌশল বেশি অবলম্বন করে থাকে।

বাজার অনুসারীর কৌশল
Market Follower's Strategies

বাজার অনুসারিকে প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশ যেন সৃষ্টি না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে উন্নয়নের পথ খুঁজে নিতে হয়। বাজার অনুসারির কৌশলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **নকলকারী (Counterfeiter):** এক্ষেত্রে অনুসারী বাজার নেতার পণ্য, মোড়ক, নাম, ডিজাইন ইত্যাদি নকল করে কালোবাজারি ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রয় করে। যেমন- ব্র্যান্ডড পোশাক, ব্যাগ, গানের সিডি, সিনেমা, সফটওয়্যার ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের নকলকারী দেখা যায়।

২. **অনুজীবী (Cloner):** অনুজীবী নতুন কিছু উন্নয়ন না করে, বাজার নেতার পণ্য, নাম, সাইজ, মোড়ক ইত্যাদি সামান্য পরিবর্তন করে বাজারে ছাড়ে । যেমন- আমাদের দেশে বাটা কোম্পানির নাম সামান্য পরিবর্তন করে রাটা করে পণ্য বিক্রয় করতে দেখা যায়।

৩. **অনুকরণকারী (Copier):** এক্ষেত্রে অনুসারী বাজার নেতার কিছু বিষয় নকল করে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র বজায় রাখে। যেমন- মোড়ক, মূল্য, বিজ্ঞাপন এবং স্থান এর ক্ষেত্রে পৃথক কৌশল গ্রহণ করে। আগ্রাসীভাবে বাজার নেতাকে আক্রমণ না করা পর্যন্ত নেতা এদের নিয়ে মাথা ঘামায় না।

৪. **অভিযোজন (Adapter):** অভিযোজন বাজার নেতার পণ্য ও অন্যান্য বাজারজাতকরণ কর্মসূচির সাথে খাপ খাওয়ায় বা মান উন্নয়ন করে ব্যবহার করে। এতে বাজার নেতাকে এড়িয়ে অন্য বাজার অংশে পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়। তবে অভিযোজন ভবিষ্যতে নেতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বাজার নিশ্‌র কে?
Who is Market Nicher?

কোনো বাজারের যেসব প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাজার অংশ নিয়ে চিন্তা না করে একটি বিশেষ অংশের উপর পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে অভীষ্ট ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে তাদেরকে বাজার নিশ্‌র বলে। মোট বাজারের সাধারণত ১০% বাজার নিশ্‌র দখল করে থাকে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বাজার নেতা বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না। তারা বেশি গুরুত্ব দেয় কতটা সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করে ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করা যায়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য সাধারণত সীমিত থাকে।

বাজার নিশ্‌র-এর কৌশল

Market Nicher's Strategies

বাজার কোটারি বা নিশ্‌ার বাজারের ক্ষুদ্র কোটরকে লক্ষ্য করে বাজারে টিকে থাকে। কোটারির কাজ তিনটি; যথা- কোটর সৃষ্টি করা, সম্প্রসারণ করা ও রক্ষা করা। বাজার কোটারির কৌশলের মূলকথা হচ্ছে তাকে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করতে হবে। নিচে কোটারির কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. **চূড়ান্ত ব্যবহারকারী বিশেষজ্ঞ (End User Specialist):** একজন বাজার কোটারি চূড়ান্ত ব্যবহারকারীদের নিকট বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে।

২. **উলম্ব স্তর বিশেষজ্ঞ (Vertical Level Specialist):** উৎপাদন ও বণ্টন শিকলের যে কোনো বা একাধিক স্তরে প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

৩. **ক্রেতা আয়তন বিশেষজ্ঞ (Customer Size Specialist):** বড় প্রতিযোগীদের নিকট ততটা গুরুত্ব পায় না এমন ছোট আয়তনের ক্রেতাদের কোটারি সেবা প্রদান করতে পারে।

৪. **নির্দিষ্ট ক্রেতা বিশেষজ্ঞ (Specific Customer Specialist):** কোটারি তার সকল পণ্য একটি বা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করতে পারে।

৫. **ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ (Geographic Specialist):** নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি অঞ্চল, এলাকা বা স্থানে প্রতিষ্ঠান তার পণ্য বিক্রয় করতে পারে।

৬. **পণ্য বা পণ্য সারি বিশেষজ্ঞ (Product or Product line Specialist):** প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ পণ্য সারি বা পণ্য বিক্রয় বা উৎপাদন করতে পারে।

৭. **পণ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষজ্ঞ (Product Feature specialist):** নির্দিষ্ট ধরনের পণ্য বা পণ্য বৈশিষ্ট্য উৎপাদনে প্রতিষ্ঠান দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

৮. **জব-শব বিশেষজ্ঞ (Job-shop Specialist):** প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক ক্রেতার জন্য ক্রেতার চাহিদা উপযোগী পণ্য তৈরি করতে পারে। যেমন- একজন স্বর্ণ দোকানে ক্রেতার পচ্ছন্দ অনুযায়ী গহণার ডিজাইন করে বিক্রয় করা হয়।

৯. **মান-মূল্য বিশেষজ্ঞ (Quality Specialist):** প্রতিষ্ঠান উচ্চমানের পণ্য উচ্চমূল্যে বিক্রয় করতে পারে বা নিম্ন মানের পণ্য নিম্ন মূল্যে বিক্রয় করতে পারে। অর্থাৎ, উচ্চ যা নিম্ন যে কোনো পর্যায়ে সেবা দিতে পারে।

১০. **সেবা বিশেষজ্ঞ (Service Specialist):** কোনো বিশেষ ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞ হতে পারে। যা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো দিচ্ছে না।

১১. **প্রণালি বিশেষজ্ঞ (Channel Specialist):** একটি মাত্র বণ্টন প্রণালি ব্যবহার করে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

সারসংক্ষেপ:

যেসব প্রতিষ্ঠান বাজার নেতার সাথে প্রতিযোগিতা না করে, নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করে বাজার শেয়ার ধরে রাখে ও বাজার নেতাকে অনুসরণ করে তাদেরকে বাজার অনুসারি বলে। বাজার অনুসারির কৌশলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- নকলকারী, অনুজীবী, অনুকরণকারী ও অভিযোজন। কোনো বাজারের যেসব প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাজার অংশ নিয়ে চিন্তা না করে একটি বিশেষ অংশের উপর পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে অভীষ্ট ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করতে সচেস্ট থাকে তাদেরকে বাজার নিশার বলে। কোটারির কৌশলগুলো হলো- চূড়ান্ত ব্যবহারকারী বিশেষজ্ঞ, উলম্ব স্তর বিশেষজ্ঞ, ক্রেতা আয়তন বিশেষজ্ঞ, নির্দিষ্ট ক্রেতা বিশেষজ্ঞ, ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ, পণ্য বা পণ্য সারি বিশেষজ্ঞ, পণ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষজ্ঞ, জব-শব বিশেষজ্ঞ, মান-মূল্য বিশেষজ্ঞ, সেবা বিশেষজ্ঞ ও প্রণালি বিশেষজ্ঞ।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. ব্র্যান্ড কী? ব্র্যান্ডিং সিদ্ধান্তসমূহ বর্ণনা করুন।
২. ব্র্যান্ড ইক্যুইটি কী উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. প্রতিযোগীতামূলক ফ্রেম অব রেফারেন্স কী ব্যাখ্যা করুন।
৪. পার্থক্য নির্দেশক বিন্দু ও পয়েন্টস অব প্যারিটি মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
৫. ব্র্যান্ড মন্ত্র কী? এর প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৬. ব্র্যান্ড মন্ত্র হচ্ছে কোনো ব্র্যান্ডের অন্তর্নিহিত বিষয় যা উচ্চারণযোগ্য ও বোধগম্য- ব্যাখ্যা করুন।
৭. প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ কৌশল কী ব্যাখ্যা করুন।
৮. প্রতিযোগী বিশ্লেষণ কী? প্রতিযোগী বিশ্লেষণের ধাপসমূহ আলোচনা করুন।
৯. কোন কোন বিষয় খেয়াল রেখে প্রতিযোগী বিশ্লেষণ করা হয়? বর্ণনা করুন।
১০. বাজার নেতা কে? বাজার নেতার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
১১. বাজার নেতার প্রতিরক্ষা কৌশল আলোচনা করুন।
১২. বাজার নেতার বাজার শেয়ার সম্প্রসারণ কৌশল বর্ণনা করুন।
১৩. বাজার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
১৪. বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ কৌশলসমূহ আলোচনা করুন।
১৫. বাজার অনুসারি কে ও বাজার অনুসারীর কৌশল বর্ণনা করুন।
১৬. বাজার নিশার কে ও বাজার নিশার-এর কৌশল আলোচনা করুন।

তথ্যসূত্র

- Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Principles of Marketing* (16 ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15e ed.). Pearson Education.
- Ramaswamy, N. (2009). *Marketing Management – Global Perspective, Indian Context* (4e ed.). Macmillan Publishers India.
- McCarthy, E. J., Shapiro, S. J., & Perreault, W. D. (1979). *Basic marketing*. Irwin-Dorsey.
- রেজা, ম.স. ও পারভেজ, ম.ম. (২০০৮) বাজারজাতকরণ নীতিমালা. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়.
- https://www.forbes.com/powerful-brands/list/, Accessed on 26th March 2019